ইউনিট

৮

উপমহাদেশে মুসলিম অভিযান

ভূমিকা

ইসলামপূর্ব যুগ থেকেই আরব বণিকগণ ভারতীয় উপমহাদেশের সাথে ব্যবসা-বাণিজ্য করতো। আরবে ইসলামের আবির্ভাবের পরও এই ধারা অব্যাহত থাকে। আরব নাবিকদের অনেকেই উপমহাদেশের পশ্চিম ও পূর্ব উপকূলে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে থাকে। স্থানীয় রমণীদের সাথে তাদের বিয়ে-সাদী হয়। এভাবে কালক্রমে তারা বেশ কয়েকটি উপনিবেশ গড়ে তোলে। কিন্তু ইসলামের আবির্ভাবের প্রায় একশ' বছর পর ভারতে মুসলমান শাসনের গোড়াপত্তন হয়। উমাইয়া বংশের প্রথম ওয়ালিদ তখন আরব জাহানের খলিফা। তাঁর অধীনে ইরাকের গভর্নর ছিলেন হাজ্জাজ বিন-ইউসুফ। হাজ্জাজের নির্দেশে মুসলমানগণ ৭১২ খ্রিস্টাব্দে সর্বপ্রথম ভারতের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে অভিযান চালায়। তারা সিন্ধু ও মুলতান অধিকার করে। এই ঘটনার প্রায় তিনশ' বছর পর গজনীর সুলতান মাহমুদ ভারত অভিযান করেন। এটি ছিল মুসলিম অভিযানের দ্বিতীয় পর্যায়। এই পর্যায়ে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও পাঞ্জাব মুসলমান অধিকারে আসে। মাহমুদের অভিযানের প্রায় পৌনে দু'শ বছর পর ঘোর থেকে তৃতীয় ও চূড়ান্ত পর্যায়ের অভিযান চালানো হয়। শিহাবউদ্দীন মুহম্মদ ছিলেন এই অভিযানের নায়ক। ঘোরের লোক ছিলেন বলে ভারতের ইতিহাসে তিনি মুহম্মদ ঘোরী নামে পরিচিত। তিনি দিল্লী ও এর আশেপাশের এলাকা দখল করেন। ফলে ভারতে স্থায়ীভাবে মুসলমান শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়।

পাঠ ১

সিন্ধু বিজয়ের কারণ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি–

- সিন্ধু বিজয়ের কারণ হিসেবে সিন্ধুর তৎকালীন রাজনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে বিবরণ দিতে পারবেন।
- জলদস্যুদের দ্বারা আরব জাহাজ লুণ্ঠনের কাহিনী বর্ণনা করতে পারবেন।
- আরবদের সাম্রাজ্য বিস্তার নীতি সম্পর্কে লিখতে পারবেন।

দাহির তখন সিন্ধু ও মুলতানের রাজা। আর আরব সাম্রাজ্যের খলিফা প্রথম ওয়ালিদ। আরব সাম্রাজ্যের পূর্বাঞ্চল অর্থাৎ ইরাক প্রদেশের গভর্ণর ছিলেন হাজ্জাজ বিন ইউসুফ। সিন্ধু মুলতান ও আরব সাম্রাজ্যের মধ্যে সাধারণ সীমান্ত ছিল। নানা কারণে হাজ্জাজ বিন ইউসুফ ও রাজা দাহিরের মধ্যে মনোমালিন্য হয়। হাজ্জাজ সিন্ধু জয় করার জন্য তাঁর জামাতা ও ভ্রাতুস্পুত্র মুহম্মদ বিন কাসিমের নেতৃত্বে ৭১২ খ্রিস্টাব্দে অভিযান প্রেরণ করেন। কারণগুলো নিম্নে আলোচনা করা হয় ঃ

সিন্ধু বিজয়ের কারণ

অর্থনৈতিক কারণ

ভারত ধন-ঐশ্বর্যের জন্য বিখ্যাত ছিল। ভারতের ধনরত্ন লাভের জন্য আরবগণ সিন্ধু অভিযানের পরিকল্পনা করে।

রাজনৈতিক কারণ

রাজা দাহিরের রাজ্য ও আরব সাম্রাজ্যের মধ্যে ছিল সাধারণ সীমানা। ফলে দুই রাজ্যের মধ্যে প্রায়ই মন কসাকসির সৃষ্টি হতো। সীমান্ত সংঘর্ষও লেগেই ছিল। হাজ্জাজ ছিলেন কঠোর প্রকৃতির শাসক। অনেক আরব অপরাধী আইনের শাসন এড়িয়ে রাজা দাহিরের রাজ্যে আশ্রয় নিয়েছিল। এ সকল

কারণে রাজনৈতিক তিক্ততা উত্তরোত্তর বাড়তে থাকে। এই সময় সিন্ধুতে চলছিল রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা। দাহির ছিলেন অত্যাচারী শাসক। সেখানে ব্রাহ্মণদের আধিপত্য ছিল। নিম্নশ্রেণীর লোকেরা ছিল অত্যাচারিত। বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের কোন রাজনৈতিক অধিকার ছিল না। সুতরাং হাজ্জাজ ভেবেছিলেন দাহির জনপ্রিয় রাজা নন এবং সিন্ধু জয় করা তাঁর পক্ষে তেমন কঠিন হবে না। তিনি সিন্ধু জয় করে সাম্রাজ্যের বিস্তার ঘটাতে চেয়েছিলেন।

ধর্মীয় কারণ

কোন কোন ঐতিহাসিক মনে করেন ভারতে ইসলাম প্রচার করাও হাজ্জাজের একটি উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু আধুনিক ঐতিহাসিকগণ একথা মানেন না।

জলদস্যু কর্তৃক জাহাজ লুণ্ঠন

বেশ কয়েকজন আরব বণিক শ্রীলংকায় প্রাণত্যাগ করেন। শ্রীলংকার রাজা তাদের মৃতদেহ, পরিবার-পরিজন ও অর্থসামগ্রী আটটি জাহাজে বোঝাই করে মুসলিম সাম্রাজ্যের রাজধানী দামেস্কে পাঠান। সাথে খলিফা এবং হাজ্জাজের জন্য কিছু উপহারও ছিল। সিন্ধুর বন্দর দাইবুলের (বর্তমান করাচির সন্নিকটে) কাছে এ সকল জাহাজ জলদস্যুদের দ্বারা লুণ্ঠিত হয়। হাজ্জাজ সিন্ধুর রাজা দাহিরের নিকট ক্ষতিপূরণ ও অপরাধীদের শাস্তি দাবি করেন। কিন্তু দাহির বলে পাঠান যে, জলদস্যুদের উপর তাঁর কোন নিয়ন্ত্রণ নেই। সুতরাং তাঁর পক্ষে হাজ্জাজের দাবি পূরণ করা সম্ভব নয়। হাজ্জাজ এতে খুবই রেগে যান। তিনি দাহিরকে সমুচিত শিক্ষা দেয়ার সিদ্ধান্ত নেন। তিনি খলিফার নিকট থেকে প্রয়োজনীয় অনুমতি গ্রহণ করেন। ওবায়দুল্লাহ ও বুদাইলের নেতৃত্বে পর পর দুটি অভিযান পাঠানো হয়। কিন্তু দুটি অভিযানই ব্যর্থ হয়। অবশেষে হাজ্জাজ তাঁর জামাতা ও ভ্রাতুস্পুত্র মুহম্মদ বিন কাসিমের নেতৃত্বে তৃতীয় অভিযান প্রেরণ করেন। এই অভিযান সফল হয়।

সার-সংক্ষেপ

খলিফা প্রথম ওয়ালিদের সময় মুসলমানগণ সিন্ধু অভিযান করে। খলিফার অনুমতি নিয়ে ইরাকের গভর্ণর হাজ্জাজ বিন ইউসুফ এই অভিযান পাঠান। সিন্ধুর রাজা তখন দাহির। সিন্ধু বিজয়ের অনেকগুলো কারণ ছিল। সাম্রাজ্যের বিস্তার সাধন এবং অর্থ সম্পদ লাভই ছিল মূল উদ্দেশ্য। ধর্ম প্রচার করা কোন মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল না। জলদস্যুগণ সিন্ধুর দাইবুল বন্দরের কাছে কয়েকটি আরব জাহাজ লুণ্ঠন করেছিল। রাজা দাহির ক্ষতিপূরণ দিতে রাজি হন নি। হাজ্জাজ তাই অভিযান প্রেরণ করেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ৮.১

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

১। মুসলমানদের সিন্ধু বিজয়ের সময় আরব সাম্রাজ্যের খলিফা ছিলেন–
   ক. আবদুল মালিক।
   খ. প্রথম ওয়ালিদ।
   গ. হাজ্জাজ বিন-ইউসুফ।
   ঘ. হারুন-অর-রশীদ।

২। মুসলমানদের সিন্ধু বিজয়ের সময় সিন্ধুর রাজা ছিলেন–
   ক. রাজা দাহির।
   খ. রাজা হর্ষবর্ধন।
   গ. রাজা পরশুরাম।
   ঘ. রাজা লক্ষ্মণসেন।

৩। জলদস্যুগণ যে বন্দরের কাছে ৮টি আরব জাহাজ লুঠ করে তার নাম–
   ক. বোম্বাই।
   খ. মাদ্রাজ।
   গ. দাইবুল।
   ঘ. সুরাট।

৪। যে সেনাপতির নেতৃত্বে প্রেরিত সিন্ধু অভিযান সফল হয়েছিল তাঁর নাম–
ক. তারিক।
খ. ওবায়দুল্লা।
গ. বুদাইল।
ঘ. মুহম্মদ বিন-কাসিম।

সংক্ষিপ্ত–উত্তর প্রশ্ন

১. মুসলমানদের সিন্ধু বিজয়ের রাজনৈতিক কারণ লিখুন।
২. জলদস্যুদের দ্বারা আরব জাহাজ লুণ্ঠনের ঘটনা বর্ণনা করুন।

পাঠ ২

সিন্ধু বিজয়ের ঘটনা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি–

- মুহম্মদ বিন-কাসিমের সৈন্য বাহিনী সম্পর্কে বর্ণনা দিতে পারবেন।
- মুহম্মদ বিন-কাসিম কিভাবে দাইবুল বন্দর দখল করেন সে সম্পর্কে বিবরণ দিতে পারবেন।
- মুহম্মদ বিন-কাসিম সিন্ধুর কোন কোন শহর ও দুর্গ দখল করেন তার তালিকা দিতে পারবেন।
- মুলতান কিভাবে মুসলমানদের দখলে আসে তা বর্ণনা করতে পারবেন।

সিন্ধু বিজয়ের ঘটনা

হাজ্জাজ বিন-ইউসুফ সিন্ধু বিজয়ের সিদ্ধান্ত নিলেন। তিনি ওবায়দুল্লাহ ও বুদাইলের নেতৃত্বে পর পর দুটি অভিযান পাঠালেন। কিন্তু দুটি অভিযানই ব্যর্থ হয়। এতেও হাজ্জাজ দমলেন না। তিনি তৃতীয় অভিযান পাঠালেন। এই অভিযানের নেতৃত্ব দিলেন তাঁর ভ্রাতুস্পুত্র ও জামাতা মুহম্মদ বিন-কাসিমকে। মুহম্মদ বিন-কাসিমের বয়স তখন মাত্র সতেরো বছর। আগের দুটি অভিযান ব্যর্থ হওয়ায় এবার হাজ্জাজ ব্যাপক প্রস্তুতি নিয়েছিলেন। মুহম্মদের সৈন্যবাহিনীতে ছিল ৬০০০ পদাতিক, ৬০০০ উষ্ট্রারোহী, ৩০০০ তীরন্দাজ এবং ৩০০০ ভারবাহী পশু। তরুণ সেনানায়ক ছিলেন অসীম মনোবলের অধিকারী। নেতৃত্ব দেয়ার সকল গুণাবলীই তাঁর ছিল। মুহম্মদ মাকরানের ভেতর দিয়ে অগ্রসর হলেন।

মুহম্মদ বিন কাসিমের যুদ্ধ প্রস্তুতি

মাকরানের শাসকের সাথে তিনি বন্ধুত্ব গড়ে তোলেন। মাকরানের শাসক মুহম্মদকে আরও একটি সৈন্যবাহিনী দিয়ে সাহায্য করেন। রাজা দাহিরের অত্যাচারে অতিষ্ঠ জাঠ ও মেডগণও মুসলমানদের পক্ষে যোগ দেয়। মুসলমানদের শক্তি বৃদ্ধির জন্য হাজ্জাজ জলপথেও একদল সৈন্য পাঠান। 'বলিস্ত' নামক একপ্রকার যন্ত্রও হাজ্জাজ পাঠিয়েছিলেন। বলিস্ত ছিল এক ধরণের ক্ষেপনাস্ত্র। এই যন্ত্র দিয়ে ভারী পাথর দূরে নিক্ষেপ করে আঘাত করা যেতো।

মুহম্মদ বিন কাসিম এর বিজয় অভিযান

মুহম্মদ বিন-কাসিম প্রথমেই দাইবুল বন্দর অবরোধ করেন। ব্রাহ্মণ ও রাজপুতগণ দাইবুল রক্ষার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করে। কিন্তু মুহম্মদ বিন-কাসিম ছিলেন খুবই চতুর সেনানায়ক। দাইবুলের প্রধান মন্দিরের চূড়ায় একটা লাল নিশান উড়ানো ছিল। মুহম্মদ বিন-কাসিম বলিস্ত দিয়ে পাথর ছুড়ে নিশানটি নামিয়ে ফেলার নির্দেশ দেন। নিশানটি নামিয়ে ফেলা হলে হিন্দুদের মনোবল ভেঙ্গে পড়ে। তাদের ধারণা ছিল মন্দিরের চূড়ায় যতোক্ষণ নিশান উড়বে ততোক্ষণ বাইরের কোন শত্রু দাইবুল দখল করতে পারবে না। যাহোক, হিন্দুগণ অসীম সাহসে যুদ্ধ করলো। কিন্তু মুসলমানদের উন্নত রণকৌশলের কাছে তারা পরাজিত হলো। দাইবুল এলো মুসলমানদের দখলে। দাইবুল দখলের পর মুহম্মদ বিন-কাসিম সিন্ধু নদের তীর ধরে উত্তর দিকে এগিয়ে চললেন। তিনি নীরুন, সিওয়ান ও সিসাম শহরগুলো একের পর এক দখল করে নিলেন। এগুলো দখল করতে তাঁকে তেমন কোন বাঁধার মুখোমুখি হতে হয়নি। কিন্তু রাওয়ার দুর্গ দখলের ব্যাপারে মুহম্মদ বিন-কাসিমকে প্রচন্ড বাঁধার মোকাবেলা করতে হয়। এখানে রাজা দাহির এক বিশাল সৈন্যবাহিনীর সমাবেশ ঘটান। মুহম্মদ বিন-কাসিম নৌকার সেতু তৈরি করে সিন্ধু নদ পার হন। অত:পর দাহিরের বাহিনীর সাথে মুসলমানদের প্রচন্ড যুদ্ধ হয়। রাজা দাহির বীর বিক্রমে যুদ্ধ করে যুদ্ধক্ষেত্রেই প্রাণ ত্যাগ করেন। রাজার মৃত্যুতে হিন্দু সৈনিকগণ ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে এবং সবাই পালিয়ে যায়। অল্প কিছু সৈন্য নিয়ে দাহিরের বিধবা পত্নী রাণীবাঈ দুর্গে আশ্রয় নিলেন। কিন্তু দুর্গ রক্ষা করা যাবেনা ভেবে তিনি অন্ত:পুরের অন্যান্য মহিলাদের নিয়ে আগুনে ঝাঁপ দিয়ে জহরব্রত পালন করেন। রাওয়ার দুর্গ মুহম্মদ বিন-কাসিমের দখলে এলো। রাওয়ার দখলের পর মুহম্মদ বিন-কাসিম ব্রাহ্মণাবাদ দখল করেন। এরপর সিন্ধুর রাজধানী আলোর দুর্গের পতন ঘটে। আলোর রক্ষার দায়িত্বে ছিলেন দাহিরের এক পুত্র। আলোর জয় করে মুহম্মদ সিন্ধু অঞ্চলে সুশাসনের ব্যবস্থা করেন।

আলোর দখলের পর মুহম্মদ বিন-কাসিম আরও উত্তরে অগ্রসর হয়ে মুলতান জয় করেন। মুলতানের পথে তিনি রাভী নদীর তীরে অবস্থিত উচ্ দখল করেন। মুলতান দখল করতে মুসলমানদের বেশ বেগ পেতে হয়েছিল। হিন্দুগণ মুলতান রক্ষার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা চালায়। তারা প্রায় দু'মাস মুলতান দুর্গ রক্ষায় সক্ষম হয়। অবশেষে তাদের সকল প্রতিরোধ চূর্ণ করে মুহম্মদ বিন-কাসিম মুলতান দখল

করতে সক্ষম হন। মুলতান দখলের মধ্য দিয়ে রাজা দাহিরের রাজ্যের গোটাটাই মুসলমানদের দখলে চলে আসে।

সার-সংক্ষেপ

মুহম্মদ বিন-কাসিম এক শক্তিশালী বাহিনী নিয়ে সিন্ধুদেশ আক্রমণ করেন। তিনি দাইবুল, নীরুন, সিওয়ান ও সিসাম দখল করে আরও উত্তরে অগ্রসর হন। সিন্ধুরাজ দাহির রাওয়ার দুর্গ রক্ষার চেষ্টা করেন। কিন্তু তিনি যুদ্ধে নিহত হন। রাওয়ার দখলের পর মুহম্মদ বিন-কাসিম সিন্ধুর রাজধানী আলোর জয় করেন। এরপর মুলতানও মুসলমানদের দখলে আসে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ৮.২

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

১। মুহম্মদ বিন-কাসিমের সৈন্যবাহিনীতে পদাতিক সৈন্যের সংখ্যা ছিল–
ক. ৬০০০।
খ. ৭০০০।
গ. ১০০০০।
ঘ. ১৫০০০।

২। দাহিরের রাজধানী নাম ছিল–
ক. রাওয়ার।
খ. আলোর।
গ. ব্রাহ্মণাবাদ।
ঘ. উচ্।

৩। উচ্‌ের তীরে অবস্থিত নদীর নাম–
ক. সিন্ধু।
খ. বিপাশা।
গ. রাভী।
ঘ. শতদ্রু।

৪। রাজা দাহির নিহত হন–
ক. দাইবুলের যুদ্ধে।
খ. আলোরের যুদ্ধে।
গ. ব্রাহ্মণাবাদের যুদ্ধে।
ঘ. রাওয়ারের যুদ্ধে।

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. সিন্ধু বিজয়ে মুহম্মদ বিন-কাসিমের যুদ্ধ–প্রস্তুতি সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিন।
২. রাওয়ার দুর্গ জয়ের একটি বিবরণ দিন।

পাঠ ৩

সিন্ধু বিজয়ের ফলাফল

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি–

- মুসলমানদের সিন্ধু বিজয়ের রাজনৈতিক ফলাফল সম্পর্কে বর্ণনা দিতে পারবেন।
- সিন্ধু বিজয়ের সামাজিক ও অর্থনৈতিক ফলাফল বর্ণনা করতে পারবেন।
- সিন্ধু বিজয়ের সাংস্কৃতিক ফলাফল মূল্যায়ন করতে পারবেন।

সিন্ধু বিজয়ের ফলাফল

সিন্ধু বিজয়ের পর মুহম্মদ বিন-কাসিম সেখানকার শাসনকর্তার দায়িত্ব লাভ করেন। তিনি ৭১২ থেকে ৭১৫ পর্যন্ত এই দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। সিন্ধু-মুলতানে তিনি দক্ষ ও সুন্দর শাসন ব্যবস্থা গড়ে তোলেন। ওদিকে ৭১৫ খ্রিস্টাব্দে খলিফা আল ওয়ালিদের মৃত্যু হয়। পরবর্তী খলিফা সোলায়মান আল ওয়ালিদের আস্থাভাজন ও অনুগৃহীত ব্যক্তিদের প্রতি বিরূপ আচরণ শুরু করেন। নতুন খলিফা মুহম্মদকে দামেস্কে ডেকে পাঠান। সেখানে তাঁকে কারারুদ্ধ করা হয়। কারাগারেই তাঁর মৃত্যু হয়। মুহম্মদ বিন-কাসিমের অকাল মৃত্যুর ফলে তাঁর বিজয় সিন্ধু ও মুলতানেই সীমাবদ্ধ থাকে। বিশেষত: এ কারণেই মুসলমানদের সিন্ধু বিজয়ের ফলাফল সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের মধ্যে দ্বিমত রয়েছে। স্টেনলী লেনপুল মন্তব্য করেছেন, "ভারত ও ইসলামের ইতিহাসে আরবদের সিন্ধু বিজয় একটি উপাখ্যান মাত্র, এটি একটি ফলাফল বিহীন বিজয়।" কোন কোন ঐতিহাসিক তাঁর এই মতকে সমর্থন করেন। অপরদিকে আর এক দল ঐতিহাসিক মনে করেন মুহম্মদ বিন-কাসিমের সিন্ধু বিজয়ের ফলাফল ছিল সুদূর প্রসারী। আমরা সিন্ধু বিজয়ের ফলাফলকে নিম্নোক্তভাবে সাজাতে পারে।

রাজনৈতিক ফলাফল

একথা সত্য যে, মুহম্মদ বিন-কাসিমের বিজয় শুধুমাত্র সিন্ধু ও মুলতানেই সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু তাই বলে এ বিজয়কে নিষ্ফল বলা যায় না। আরবরা সিন্ধু অঞ্চলে এক উন্নত প্রশাসনিক ব্যবস্থা গড়ে তোলে। আল-ওয়ালিদের পরবর্তী উমাইয়া শাসকদের আমলে এবং আব্বাসীয় আমলে সিন্ধুতে মুসলমান শাসন অব্যাহত ছিল। আরব সৈন্যদের মধ্যে অনেকেই সিন্ধুতে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে থাকে। তাদের মধ্যে কেউ কেউ স্থানীয় রমণী বিয়ে করে। এভাবে ভারতে একটা স্থায়ী মুসলমান বসতি গড়ে উঠে। তারা রাস্তাঘাট, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, মসজিদ ও অন্যান্য দালান-কোঠা নির্মাণ করে। আরব বংশধর ও হিন্দুগণ দীর্ঘকাল পাশাপাশি বসবাস করে। একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, মুহম্মদ বিন-কাসিমের বিজয় সুলতান মাহমুদকে বারবার ভারত অভিযানে অনুপ্রাণিত করেছিল। সুলতান মাহমুদের পর মুহম্মদ ঘোরী ভারতের বিস্তীর্ণ অঞ্চল জয় করেন। মুহম্মদ বিন-কাসিমের বিজয়কে ভিত্তি করেই পরবর্তীকালে ভারতে দীর্ঘস্থায়ী মুসলমান শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

সামাজিক ও অর্থনৈতিক ফলাফল

সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও সিন্ধু বিজয়ের সুদূরপ্রসারি ফলাফল লক্ষ করা যায়। স্থানীয় অধিবাসীগণ মুসলমানদের সংস্পর্শে আসে। তারা ইসলামের সাম্য ও মৈত্রীর আদর্শ দ্বারা আকৃষ্ট হয়। জাঠ ও মেডগণ এজন্যই মুসলমানদের স্বাগত জানিয়েছিল। হিন্দুধর্মের জাতিভেদ প্রথা এবং সামাজিক অবিচার থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য নিম্নশ্রেণীর হিন্দুগণ দলে দলে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়। মুসলমানদের সংস্পর্শে আসার ফলে ভারতীয় সমাজের বর্ণভেদ ও জাতিভেদ প্রথার কঠোরতা বহুলাংশে হ্রাস পায়। এই বিজয়ের ফলে আরব সাম্রাজ্যের সাথে ভারতের ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধি পায়। ফলে দু'পক্ষই অর্থনেতিক দিক থেকে লাভবান হয়।

সাংস্কৃতিক ফলাফল

সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে আরবদের সিন্ধু বিজয়ের ফলাফল ছিল সর্বাপেক্ষা সুদূর প্রসারী। সিন্ধু বিজয়ের পূর্বে আরবগণ গ্রিক, মিসরীয়, মেসোপটেমীয় এবং পারসিক সংস্কৃতির সাথে পরিচিত হয়। তারা এ সকল সংস্কৃতির মধ্যে এক ধরনের সমন্বয় সাধন করে। মুসলমানগণ যখন ভারতে আসে তখন তারা ছিল এই সমন্বিত সংস্কৃতি ও সভ্যতার অধিকারী। ভারতীয়গণ দর্শন, সাহিত্য, গণিত, চিকিৎসাশাস্ত্র, জ্যোতির্বিদ্যা, সংগীত, চিত্রশিল্প প্রভৃতিতে প্রাচীনকাল থেকেই উন্নতি সাধন করেছিল। ঋদ্ধ মুসলমানগণ হিন্দু পন্ডিত ও গুণীদের সংস্পর্শে আসায় যেন সোনা ও সোহাগার মিলন হলো। এতে ভারতীয় জ্ঞান ভান্ডার ও ইসলামি জ্ঞান ভান্ডারের মধ্যে ভাব বিনিময় ঘটলো। ভারতীয় সভ্যতা ও

ইসলামি সভ্যতার মধ্যে যোগাযোগের ফলে দু'পক্ষই লাভবান হলো। আব্বাসীয় যুগের খলিফাগণ ভারতীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের বই-পুস্তক আরবি ভাষায় অনুবাদ করার ব্যবস্থা করে এক স্বর্ণযুগের সূচনা করেছিলেন। উদাহরণ হিসেবে 'সিন্দহিন্দ' নামক গ্রন্থের কথা উল্লেখ করা যায়। খলিফা মনসুরের সময় কয়েকজন ভারতীয় পন্ডিত বাগদাদ যান। তারা সাথে করে নিয়ে যান জ্যোতির্বিদ্যার উপর 'সিদ্ধান্ত' নামক সংস্কৃত গ্রন্থটি। আরবীয় পন্ডিতগণ এটি আরবি ভাষায় অনুবাদ করেন। অনূদিত গ্রন্থটির নামকরণ করা হয় 'সিন্দহিন্দ'। ভারতীয়দের কাছ থেকেই আরবগণ গাণিতিক সংখ্যা সম্পর্কে ধারণা লাভ করে। চিকিৎসা শাস্ত্রের উপর লিখিত 'চরক' ও 'সুশ্রুত' আরবিতে অনূদিত হয়। 'পঞ্চতন্ত্রের' হিতোপদেশ আরবিতে অনূদিত হয়ে আরব ভূ-খন্ডে ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করে। ইরানি ও ভারতীয় দর্শনের সংমিশ্রনে সুফীবাদের জন্ম হয়।

সার-সংক্ষেপ

আরবদের সিন্ধু বিজয়ের রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ফলাফল ছিল সুদূরপ্রসারী। সিন্ধু বিজয় পরবর্তী মুসলিম অভিযানকে সম্ভব ও সফল করে তুলেছিল। ভারতীয় সমাজের বর্ণভেদ ও জাতিভেদ প্রথা ইসলামের সংস্পর্শে এসে বহুলাংশে হ্রাস পায়। দু'দেশের মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্যের ব্যাপক প্রসার ঘটে। ইসলামি ও ভারতীয় সভ্যতা-সংস্কৃতির পারস্পরিক সাহচর্যে উভয় সভ্যতা লাভবান হয়। মুসলমানগণ ভারতীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাথে পরিচিত হয়। ভারতে সুফীবাদের উন্মেষ ঘটে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ৮.৩

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

১। খলিফা আল-ওয়ালিদের পরবর্তী খলিফা ছিলেন–
   ক. সোলায়মান।
   খ. হাজ্জাজ বিন-ইউসুফ।
   গ. মুহম্মদ বিন-কাসিম।
   ঘ. ওমর বিন-আবদুল আজিজ।

২। খলিফা আল-ওয়ালিদের মৃত্যু হয়–
   ক. ৭১২ খ্রিস্টাব্দে।
   খ. ৭১৫ খ্রিস্টাব্দে।
   গ. ৭১৭ খ্রিস্টাব্দে।
   ঘ. ৭২০ খ্রিস্টাব্দে।

৩। যে সংস্কৃত পুস্তক আরবি ভাষায় অনুবাদ করার পর তার নামকরণ হয় সিন্দহিন্দ–
   ক. পঞ্চতন্ত্র।
   খ. চরক।
   গ. সুশ্রুত।
   ঘ. সিদ্ধান্ত।

৪। চরক গ্রন্থটির আলোচ্য বিষয়–
   ক. জ্যোতির্বিদ্যা।
   খ. গণিত।
   গ. চিকিৎসাবিজ্ঞান।
   ঘ. নীতিশাস্ত্র।

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. মুসলমানদের সিন্ধু বিজয়ের রাজনৈতিক ফলাফল লিখুন।
২. সিন্ধু বিজয়ের সামাজিক ও অর্থনৈতিক ফলাফলের বিবরণ দিন।
৩. সিন্ধু বিজয়ের সাংস্কৃতিক ফলাফল মূল্যায়ন করুন।

মুসলমান আক্রমণের প্রাক্কালে ভারত

পাঠ ৪

সুলতান মাহমুদের অভিযানের কারণ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি–

- সুলতান মাহমুদের ভারত অভিযানের রাজনৈতিক কারণ বর্ণনা করতে পারবেন।
- অর্থনৈতিক কারণ বিশ্লেষণ করতে পারবেন।
- অভিযানের সামরিক উদ্দেশ্য সম্পর্কে বিবরণ দিতে পারবেন।
- অভিযানের পশ্চাতে কোন ধর্মীয় উদ্দেশ্য ছিল কিনা নির্ণয় করতে পারবেন।

মুহম্মদ বিন-কাসিমের সিন্ধু অভিযানের প্রায় তিনশ বছর পর সুলতান মাহমুদ ভারত অভিযান করেন। সুলতান মাহমুদ জাতিতে তুর্কী। তিনি ছিলেন গজনীর আমীর সবুক্তগীনের পুত্র। সবুক্তগীনের মৃত্যুর পর তাঁর ছোট ছেলে ইসমাইল সিংহাসনে বসেন। ইসমাইলকে পরাজিত ও কারারুদ্ধ করে মাহমুদ ক্ষমতা দখল করেন। তিনি আমীর-এর পরিবর্তে সুলতান উপাধি ধারণ করেন। বাগদাদের ক্ষমতাহীন খলিফা কাদির বিল্লাহ তাকে 'ইয়ামিন-উদ-দৌলা' ও 'আমিন-উল-মিল্লাত' খেতাবে ভূষিত করেন। ১০০০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১০২৬ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে তিনি সতেরো বার ভারত অভিযান করেন। তাঁর এই অভিযানের কয়েকটি কারণ ছিল। এই কারণগুলোকে আমরা রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামরিক ও ধর্মীয় -এই চারটি ভাগে ভাগ করে আলোচনা করতে পারি।

সুলতান মাহমুদের ভারত অভিযানের কারণ

রাজনৈতিক কারণ

সুলতান মাহমুদের পিতা সবুক্তগীনের সময় থেকে গজনীর সাথে পাঞ্জাবের হিন্দু শাহী বংশের বিরোধ চলে আসছিল। শাহী রাজ্যের রাজা জয়পাল ছিলেন সবুক্তগীনের শত্রু। সুতরাং মাহমুদ জয়পালের সাথে শত্রুতা উত্তরাধিকার সূত্রেই পেয়েছিলেন। ভারতের অনেক রাজা আনন্দপালের সাথে মাহমুদ বিরোধী জোটে যোগদান করেন। সুতরাং মাহমুদকে তাঁদের বিরুদ্ধেও অভিযান পরিচালনা করতে হয়। আবার ভারতের কোন কোন রাজা মাহমুদের সাথে বন্ধুত্ব সূত্রে আবদ্ধ হয়। এতে তাঁদের প্রতিবেশী রাজণ্যবর্গ তাঁদের প্রতি বৈরীসুলভ আচরণ শুরু করেন। মিত্রবর্গের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্যও মাহমুদকে ভারতে অভিযান করতে হয়। পরাজিত রাজারা মাহমুদের সাথে সন্ধি করেন। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ সুযোগ পেয়ে সন্ধি শর্ত ভঙ্গ করেন। বিদ্রোহী রাজাদের সন্ধি শর্ত পালনে বাধ্য করার জন্যও মাহমুদকে অভিযান করতে হয়।

অর্থনৈতিক কারণ

সুলতান মাহমুদ দক্ষ প্রশাসন ব্যবস্থা গড়ে তোলেন। তাঁর ছিল একটা অত্যন্ত শক্তিশালী সৈন্যবাহিনী। রাজধানী গজনীকে তিনি মনের মতো করে সাজাতে চেয়েছিলেন। তিনি ছিলেন জ্ঞানী-গুণীর পৃষ্ঠপোষক। এসবের জন্য তাঁর প্রচুর অর্থের প্রয়োজন ছিল। গজনীর রাষ্ট্রীয় কোষাগার তাঁর চাহিদার যোগান দিতে পারতো না। তাই তিনি বাইরে থেকে অর্থ সংগ্রহের পরিকল্পনা করেন। ভারত ছিল তখন অত্যন্ত ধনী দেশ। এখানকার বিভিন্ন রাজ্যের কোষাগার ধনরত্নে পূর্ণ ছিল। ধর্মপ্রাণ বিত্তশালী ব্যক্তিবর্গ অকাতরে মন্দিরগুলোতে দান করতো। মন্দিরকে নিরাপদ বিবেচনা করে অনেক সময় রাজারাও তাতে ধনরত্ন সংরক্ষণ করতেন। সুতরাং স্বাভাবিকভাবেই সুলতান মাহমুদের নজর ভারতের উপর পড়ে। তাই তিনি প্রায় প্রতি বছর ভারত আক্রমণ করেন এবং ভারত থেকে প্রচুর ধন-রত্ন নিয়ে নিজ দেশে ফিরে যান। প্রফেসর হাবিব, প্রফেসর নাজিম, ডব্লিও হেইগ প্রমুখ আধুনিক ঐতিহাসিকগণ মাহমুদের ভারত অভিযানের কারণ হিসেবে অর্থনৈতিক কারণকে অধিকতর গুরুত্ব দিয়েছেন। তাই বলে মাহমুদকে লুণ্ঠনকারী বা অর্থলোলুপ তস্কর বলা যাবে না। ভারত থেকে সংগৃহীত অর্থ তিনি মানব কল্যাণে ব্যয় করেন। নিজের ভোগ-বিলাসের জন্য তিনি সে অর্থ ব্যবহার করেন নি।

সামরিক উদ্দেশ্য

রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কারণ ছাড়াও সুলতান মাহমুদের ভারত অভিযানের সামরিক উদ্দেশ্য ছিল। নিজ রাজ্যের নিরাপত্তার জন্য তাঁর উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, পাঞ্জাব ও সিন্ধু দখল করা অত্যন্ত প্রয়োজন ছিল। এ সকল অঞ্চল ছিল সামরিক দিক দিয়ে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তিনি ছিলেন দক্ষ সমরবিদ। তাঁর অশ্বারোহী ও পদাতিক বাহিনী ছিল সুশৃঙ্খল ও সমরনিপুণ। তাঁর প্রতিপক্ষ ছিল দুর্বল।

তিনি জানতেন এ সকল অঞ্চল জয় করতে তাঁকে খুব একটা বেগ পেতে হবে না। সুতরাং তিনি বার বার ভারত আক্রমণ করে তাঁর সামরিক উদ্দেশ্য হাসিল করেছিলেন।

ধর্মীয় উদ্দেশ্য

কোন কোন ঐতিহাসিক মনে করেন- মাহমুদের ভারত অভিযানের পেছনে ধর্মীয় উদ্দেশ্যও কার্যকর ছিল। তাঁদের মতে তিনি ভারতে ইসলাম প্রচারে অভিলাষী ছিলেন। কিন্তু আধুনিক ঐতিহাসিকগণ এই মত স্বীকার করেন না। তাঁরা মনে করেন মাহমুদের যুগে শাসকগণ ইসলাম প্রচার করা আর তেমন কর্তব্য বলে মনে করতেন না। মাহমুদের ভারত অভিযানের আসল উদ্দেশ্য ছিল রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামরিক। তিনি ভারত অভিযানে এসে কোন বিধর্মীকে বলপূর্বক ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করেন নি। তাঁর সতেরো বার ভারত অভিযানের সময় একমাত্র বারনের রাজা তাঁর বেশ কিছু অমাত্য ও প্রজা সহ ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু তা তিনি করেছিলেন নিজের ইচ্ছায়। সুলতানের কোন চাপের মুখে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন নি। মাহমুদ হিন্দু মন্দির দখল করেছেন ধর্ম বিদ্বেষের কারণে নয়, বরং অর্থ পাওয়ার আশায়। আগেই বলা হয়েছে এ সকল মন্দির ছিল যুগ যুগ ধরে সঞ্চিত সম্পদে পূর্ণ।

সার-সংক্ষেপ

গজনীর সুলতান মাহমুদ সতেরো বার ভারত অভিযান করেন। তাঁর অভিযানের পশ্চাতে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামরিক কারণ নিহিত ছিল। ধর্ম প্রচার করা তাঁর উদ্দেশ্য ছিল না।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ৮.৪

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

১। মাহমুদ দেশের সুলতান ছিলেন–
   ক. আফগানিস্তান।
   খ. গজনী।
   গ. ঘোর।
   ঘ. কাবুল।

২। বাগদাদের খলিফা কাদির বিল্লাহ সুলতান মাহমুদকে উপাধি দিন–
   ক. সুলতান।
   খ. সুলতান-উস-সালাতিন।
   গ. ইয়ামিন-উদ-দৌলা।
   ঘ. সুলতান-উল-আজম।

৩। সুলতান মাহমুদ ভারতে অভিযান করেন–
   ক. ১২ বার।
   খ. ১৪ বার।
   গ. ১৬ বার।
   ঘ. ১৭ বার।

৪। শাহী বংশের যে রাজার সাথে সবুক্তগীনের বিরোধ ছিল তাঁর নাম–
   ক. জয়পাল।
   খ. আনন্দপাল।
   গ. ত্রিলোচনপাল।
   ঘ. রাজ্যপাল।

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. সুলতান মাহমুদের ভারত অভিযানের রাজনৈতিক কারণের বিবরণ দিন।
২. সুলতান মাহমুদের ভারত অভিযানের অর্থনৈতিক কারণ বিশ্লেষণ করুন।
৩. সুলতান মাহমুদের ভারত অভিযানের সামরিক কারণ সম্পর্কে বর্ণনা দিন।
৪. সুলতান মাহমুদের ভারত অভিযানের পেছনে কোন ধর্মীয় উদ্দেশ্য ছিল কি? ব্যাখ্যা করুন।

পাঠ ৫

উপমহাদেশে সুলতান মাহমুদের প্রধান প্রধান অভিযান

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি–

- ভারতীয় উপমহাদেশে সুলতান মাহমুদের প্রধান প্রধান অভিযানসমূহ সম্পর্কে বিবরণ দিতে পারবেন।
- ভারতের কোন কোন অঞ্চল তিনি তাঁর সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন সে সম্পর্কে বর্ণনা দিতে পারবেন।
- সুলতান মাহমুদের অভিযান প্রতিহত করার জন্য ভারতীয় রাজাগণ যে ব্যবস্থা গ্রহণ করেন তা বর্ণনা করতে পারবেন।

উপমহাদেশে সুলতান মাহমুদের প্রধান প্রধান অভিযান

পিতার মৃত্যুর পর ভাই ইসমাইলকে পরাজিত করে মাহমুদ গজনীর সিংহাসনে বসেন। ১০০০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১০২৭ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে তিনি ১৭ বার ভারতীয় উপমহাদেশে অভিযান চালান। প্রথমে তিনি খাইবার গিরিপথের কয়েকটি দুর্গ দখল করেন। ১০০০ খ্রিস্টাব্দে তিনি পাঞ্জাবের রাজা জয়পালের সাথে যুদ্ধ করেন। তাঁর পিতা সবুক্তগীনের সময় থেকেই জয়পালের সাথে তাদের শত্রুতা চলে আসছিল। বীরবিক্রমে যুদ্ধ করেও জয়পাল পরাজিত হন। তিনি কয়েকজন পুত্র-পৌত্রসহ সুলতানের সৈন্যদের হাতে বন্দী হন। কয়েকটি শর্তে তিনি মুক্তি পান। কিন্তু পরাজয়ের গ্লানি তিনি সইতে পারলেন না। তিনি তাঁর পুত্র আনন্দপালের হাতে রাজ্যের ভার ছেড়ে দেন। অত:পর তিনি আগুনে ঝাঁপ দিয়ে প্রাণত্যাগ করেন। জয়পালের পৌত্র সুখপাল ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। তাঁর নতুন নাম হয় 'নওশাহ'।

ভীরা রাজ্যের বিরুদ্ধে অভিযান

১০০৪ খ্রিস্টাব্দে সুলতান মাহমুদ ভীরা রাজ্যের বিরুদ্ধে অভিযান করেন। এই রাজ্যের রাজা ছিলেন বিজয় রায়। যুদ্ধে পরাজিত হয়ে বিজয় রায় পলায়ন করেন। মুসলমান সৈন্যগণ তাঁর পিছু ধাওয়া করলে পলায়ন সম্ভব নয় বুঝতে পেরে তিনি ছুরিকাঘাতে আত্মহত্যা করেন।

মুলতান আক্রমণ

১০০৬ খ্রিস্টাব্দে মাহমুদ মুলতান আক্রমণ করেন। মুলতানের শাসনকর্তা ছিলেন আবুল ফতেহ দাউদ। দাউদ পরাজিত হয়ে পলায়ন করেন। মাহমুদ নওশাহকে মুলতানের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। কিন্তু সুলতান গজনীতে ফিরে যাওয়া মাত্র নওশাহ ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করেন। সুলতান তাঁকে দমন করার জন্য আবার অভিযান করেন। এটি ছিল ভারতে তাঁর পঞ্চম অভিযান। নওশাহ পরাজিত হয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করেন।

পাঞ্জাবের রাজা আনন্দপালের বিরুদ্ধে অভিযান

১০০৮ খ্রিস্টাব্দে সুলতান মাহমুদ ভারতে তাঁর ষষ্ঠ অভিযান পরিচালনা করেন। এটি ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অভিযান। এই অভিযান পরিচালিত হয় পাঞ্জাবের রাজা আনন্দপালের বিরুদ্ধে। আনন্দপাল পার্শ্ববর্তী হিন্দু রাজ্যগুলোর রাজাদের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করেন। উজ্জয়িনী, কালিঞ্জর, গোয়ালিয়র, কনৌজ, দিল্লী ও আজমীরের রাজাগণ এই আবেদনে ব্যাপক সাড়া দেন। তাঁরা সৈন্য ও অর্থ দিয়ে আনন্দপালকে সাহায্য করেন। হিন্দু রমণীগণ তাদের গায়ের গহনা পর্যন্ত খুলে যুদ্ধের খরচ হিসেবে পাঠায়। আনন্দপাল এক বিশাল সৈন্যবাহিনী নিয়ে মাহমুদের মুখোমুখি হন। ওয়াইহিন্দ নামক স্থানে উভয়পক্ষে এক প্রচন্ড যুদ্ধ হয়। যুদ্ধের প্রথম পর্যায়ে আনন্দপালের সম্মিলিত বাহিনীই সুবিধাজনক অবস্থায় ছিল। কিন্তু হঠাৎ আনন্দপালের হাতী ভয় পেয়ে যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করে। এতে তাঁর বাহিনী ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে। সুলতান মাহমুদ বিজয়ী হন। পাঞ্জাব থেকে তিনি প্রচুর ধন-রত্ন গজনীতে নিয়ে যান।

ত্রিলোচন পালের বিরুদ্ধে অভিযান

আনন্দপাল যুদ্ধে হেরে যাওয়ার পর নন্দনা নামক স্থানে নতুন রাজধানী স্থাপন করে শাসন করতে থাকেন। সেখানে তাঁর স্বাভাবিক মৃত্যু হয়। অত:পর রাজা হন তাঁর পুত্র ত্রিলোচনপাল। ত্রিলোচনপালের সাথেও মাহমুদের সুসম্পর্ক ছিল না। মাহমুদ ১০১৪ খ্রিস্টাব্দে ত্রিলোচনপালের রাজধানী নন্দনা আক্রমণ করেন। এটি ছিল তাঁর নবম অভিযান। যুদ্ধে হেরে গিয়ে ত্রিলোচনপাল কাশ্মীরে পলায়ন করেন। কাশ্মীরের রাজা তুঙ্গ তাঁকে আশ্রয় দেন। মাহমুদের সাথে তাঁদের যুদ্ধ হয়।

এই যুদ্ধেও মাহমুদ জয়ী হন। সুলতান গজনীতে ফিরে গেলে ত্রিলোচনপাল পাঞ্জাবে ফিরে আসেন। তিনি শিবলী পাহাড়ে নতুন রাজধানী স্থাপন করেন। বুন্দেলখন্ডের রাজা বিদ্যাধরের সাথে তিনি মৈত্রী চুক্তি করেন। মাহমুদ তাঁকে এই চুক্তি নাকচ করতে বলেন। কিন্তু ত্রিলোচন এতে রাজী হন নি। মাহমুদ তাই তার বিরুদ্ধে আবার অভিযান করেন। এবার মাহমুদ পাঞ্জাব দখল করে নিজ সাম্রাজ্যে অন্তর্ভুক্ত করেন। তিনি নিজের একজন আমীরকে পাঞ্জাবের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন।

কনৌজের বিরুদ্ধে অভিযান ছিল ১২ তম

সুলতান মাহমুদের পরবর্তী গুরুত্বপূর্ণ অভিযান পরিচালিত হয় কনৌজের বিরুদ্ধে। এটি ছিল তাঁর ১২তম অভিযান। কনৌজ ভারতের কেন্দ্রীয় শক্তি হিসেবে বিবেচিত ছিল। রাজ্যপাল ছিলেন সে সময় কনৌজের রাজা। মাহমুদ ১০১৮ খ্রিস্টাব্দে একটি শক্তিশালী বাহিনী নিয়ে গজনী ত্যাগ করেন। পথে তিনি বারণ জয় করেন। বারণের রাজা তাঁর অনুচরসহ ইসলাম গ্রহণ করেন। অত:পর সুলতান কনৌজের দ্বারপ্রান্তে এসে পৌঁছেন। রাজা রাজ্যপাল সামান্য বাঁধা দানের পর আত্মসমর্পণ করেন।

গোল্ডেন বিরুদ্ধে অভিযান

রাজ্যপাল সুলতানের নিকট নতি স্বীকার করায় ভারতের অন্যান্য রাজারা তাঁর প্রতি ক্ষুব্ধ হন। কালিঞ্জরের রাজা গোন্ড তাদের নেতৃত্ব দেন। তাঁরা একজোট হয়ে কনৌজ আক্রমণ করেন। রাজ্যপালকে তাঁরা হত্যা করেন। রাজ্যপালের পুত্রকে সিংহাসনে বসানো হয়। এতে মাহমুদ খুবই ক্রোধান্বিত হন। তিনি গোন্ডকে শাস্তি দেওয়ার জন্য ভারত অভিযান করেন। গোন্ড যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে যান। এটি ছিল তার ১৩তম অভিযান।

মাহমুদের ১৪ তম ও ১৫ তম অভিযান পরিচালিত হয় যথাক্রমে গোয়ালিয়র ও কালিঞ্জরের বিরুদ্ধে। উভয় অভিযানে তিনি সফল হন। গোয়ালিয়র ও কালিঞ্জর থেকে তিনি প্রচুর ধন-রত্ন আদায় করেন। উভয় রাজ্যের রাজা বার্ষিক কর দিতে স্বীকার করেন।

ষোড়শ অভিযান ছিল সোমনাথ মন্দির আক্রমন

মাহমুদের অভিযানগুলোর মধ্যে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ছিল তাঁর ষোড়শ অভিযান। কাথিওয়ারের সোমনাথ মন্দিরের বিরুদ্ধে এই অভিযান পরিচালিত হয়। এই মন্দিরে বিপুল পরিমান ধন-রত্ন সঞ্চিত ছিল। ধনী ব্যক্তিগণ এবং রাজণ্যবর্গ এই মন্দিরে অর্ঘ হিসেবে সোনা-দানা ও হীরা-জহরত দান করতেন। তাছাড়া অনেকেই মন্দিরকে নিরাপদ স্থান মনে করে সেখানে তাদের ব্যক্তিগত ধন-রত্নও গচ্ছিত রাখতেন। হিন্দুগণ সোমনাথ মন্দিরকে অজেয় মনে করতো। মাহমুদ সোমনাথ জয়ের পরিকল্পনা করেন। তিনি ১০২৫ খ্রিস্টাব্দের শেষ দিকে গজনী থেকে বের হন। মুলতান ও রাজস্থান হয়ে তিনি সোমনাথ মন্দিরের দ্বারে এসে পৌঁছেন। পার্শ্ববর্তী রাজ্যের রাজারা সোমনাথ মন্দির রক্ষার জন্য বিপুল শক্তি সংগ্রহ করে। কিন্তু তাদের সকল বাঁধা মাহমুদ ছিন্ন করেন। তিনি মন্দিরে ঢুকে সোমনাথের মূর্তিটি খন্ডবিখন্ড করেন। এই মন্দির থেকে তিনি বিপুল সম্পদ সংগ্রহ করেন। এই সম্পদের মধ্যে ছিল দুই কোটি স্বর্ণমুদ্রা, প্রচুর অলঙ্কার ও মণি-মানিক্য। ঐতিহাসিক নাজিমের মতে, মাহমুদের সোমনাথ বিজয় ইসলামের ইতিহাসের অন্যতম দু:সাহসিক কাজ।

শেষ অভিযান জাঠদের বিরুদ্ধে

ভারতে সুলতান মাহমুদের শেষ অভিযান পরিচালিত হয় জাঠদের বিরুদ্ধে। মাহমুদ যখন সোমনাথ অভিযান শেষে গজনী ফিরছিলেন তখন জাঠগণ চোরা-গুপ্তা হামলা চালিয়ে তাঁর সৈন্যবাহিনীকে উত্যক্ত করে। তাদেরকে সমুচিত শিক্ষা দেওয়ার জন্য সুলতান ১০২৭ খ্রিস্টাব্দে তাঁর এই শেষ অভিযান পরিচালনা করেন। জাঠগণ পরাজিত হয়। তাদের অনেকেই হতাহত হয়।

সার-সংক্ষেপ

১০০০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১০২৭ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে সুলতান মাহমুদ মোট ১৭ বার ভারত অভিযান করেন। এই অভিযানগুলোর মধ্যে কয়েকটি ছিল বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। তিনি পিতৃশত্রু জয়পালকে পরাজিত করেন। জয়পালের পুত্র আনন্দপাল ভারতের অন্যান্য রাজাদের নিয়ে সুলতানের বিরুদ্ধে শক্তিজোট গঠন করেন। কিন্তু এই মিলিত শক্তি মাহমুদের নিকট পরাজিত হয়। তিনি ভারতের রাজনৈতিক কেন্দ্র কনৌজ অভিযান করেন। কনৌজরাজ রাজ্যপাল সুলতানের বশ্যতা স্বীকার করেন। সুলতান কাথিওয়ারের সোমনাথ মন্দির আক্রমণ করেন। হিন্দু রাজন্যবর্গ সোমনাথ রক্ষার চেষ্টা করেন। কিন্তু তাঁরা ব্যর্থ হন। সুলতান তাঁর প্রতিটি অভিযানে সফলতা লাভ করেন। তিনি ভারত থেকে প্রচুর ধনরত্ন গজনীতে নিয়ে যান।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ৮.৫

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

১। জয়পাল রাজ্যভার ছেড়ে দেন–
ক. আনন্দপালের হাতে।
খ. সুখপালের হাতে।
গ. ত্রিলোচনপালের হাতে।
ঘ. রাজ্যপালের হাতে।

২। বুন্দেলখণ্ডের রাজার সাথে ত্রিলোচনপাল মৈত্রী চুক্তি করেন–
ক. তুঙ্গ।
খ. বিদ্যাধর।
গ. গোন্ড।
ঘ. রাজ্যপাল।

৩। সুলতান মাহমুদ কনৌজ অভিযান করেন–
ক. ১০১৪ খ্রিস্টাব্দে।
খ. ১০১৬ খ্রিস্টাব্দে।
গ. ১০১৮ খ্রিস্টাব্দে।
ঘ. ১০২১ খ্রিস্টাব্দে।

৪। সুলতান মাহমুদ সোমনাথ মন্দির আক্রমণ করেন–
ক. ১০১৪ খ্রিস্টাব্দে।
খ. ১০২৫ খ্রিস্টাব্দে।
গ. ১০২৬ খ্রিস্টাব্দে।
ঘ. ১০২৭ খ্রিস্টাব্দে।

সংক্ষিপ্ত–উত্তর প্রশ্ন

১. আনন্দপালের বিরুদ্ধে সুলতান মাহমুদের অভিযান বর্ণনা করুন।
২. সুলতান মাহমুদের সোমনাথ বিজয়ের বিবরণ দিন।

পাঠ ৬

সুলতান মাহমুদের ভারত অভিযানের ফলাফল

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি–

- সুলতান মাহমুদের ভারত অভিযানের রাজনৈতিক ফলাফল সম্পর্কে বিবরণ দিতে পারবেন।
- অর্থনৈতিক ফলাফল বর্ণনা করতে পারবেন।
- সাংস্কৃতিক ফলাফল বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

সুলতান মাহমুদের ভারত অভিযান নিষ্ফল ছিল না। এই অভিযানের ফলাফলকে আমরা রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক এই তিন ভাগে ভাগ করে আলোচনা করতে পারি।

রাজনৈতিক ফলাফল

সুলতান মাহমুদের ভারত অভিযান

সুলতান মাহমুদের ভারত অভিযানের প্রভাব সমগ্র উত্তর-পশ্চিম ভারতে অনুভূত হয়। তবে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এই অভিযান তেমন কোন স্থায়ী ফল প্রদান করেন নি। সুলতান মাহমুদ অভিযান করেছেন, জয়লাভ করেছেন এবং ধন-সম্পদ নিয়ে নিজের রাজ্য গজনীতে ফিরে গেছেন। ভারতে তিনি কোন স্থায়ী সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন নি। শুধুমাত্র পাঞ্জাবের কিয়দংশ এবং মুলতান ছাড়া ভারতের আর কোন অঞ্চল তাঁর সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্তও হয় নি। কয়েকজন রাজা অবশ্য তাঁকে কর দিতে বাধ্য হয়েছিলেন। কিন্তু ১০৩০ খ্রিস্টাব্দে তাঁর মৃত্যুর সাথে সাথে এই সকল রাজা কর প্রদান বন্ধ করেন। পাঞ্জাব ও মুলতান ছাড়া উত্তর ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের রাজগণ তাঁদের স্ব স্ব রাজ্যে নিজেদের প্রভুত্ব পুনরায় স্থাপন করেন। এই দিক দিয়ে বিবেচনা করলে আমাদের স্বীকার করতে হবে যে সুলতান মাহমুদের ভারত অভিযান ব্যর্থ হয়। তবে এ কথাও সত্য যে, সুলতান মাহমুদের বিজয় স্থায়ী না হলেও তাঁর বিজয়ই পরবর্তীকালে মুসলমানদের ভারত বিজয়ের পথ সুগম করে দিয়েছিল। সুলতান মাহমুদের বার বার আক্রমণ উত্তর ভারতের রাজন্যবর্গের সামরিক শক্তি তছনছ করে দিয়েছিল। রাজন্যবর্গ সামরিক, প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে একেবারেই দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন। তাঁদের পক্ষে পরবর্তী মুসলমান আক্রমণ প্রতিহত করা সম্ভবপর হয় নি। সুলতান মাহমুদের অভিযানের সময় ভারতীয় সামরিক শক্তি ও রণকৌশল মুসলমানদের সামরিক শক্তি ও রণকৌশলের তুলনায় যে কত দুর্বল তা প্রকটভাবে ধরা পড়ে। সুলতান মাহমুদের সাফল্য ভারতীয় রাজন্যবর্গের মধ্যে হিংসা, অবিশ্বাস ও কলহ আরও বাড়িয়ে দেয়। পরবর্তীকালে মুহম্মদ ঘোরীর আক্রমণের সময় তাই তারা তেমনভাবে ঐক্যবদ্ধ হতে পারে নি।

অর্থনৈতিক ফলাফল

সুলতান মাহমুদের ভারত অভিযানের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ভারতের ধন-রত্ন লাভ করা। এই জন্যই তিনি ভারতের সমৃদ্ধ জনপদ, নগর, দুর্গ ও মন্দির আক্রমণ করেন। এ সকল লক্ষ্যস্থল থেকে তিনি প্রচুর সম্পদ নিজ রাজধানী গজনীতে নিয়ে যান। এর ফলে ভারত অর্থনৈতিক দিক থেকে দুর্বল হয়ে পড়ে। অপরদিকে গজনী অর্জন করে আর্থিক সমৃদ্ধি। ভারতের আর্থিক দুর্বলতা তার সামরিক শক্তি ও রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার উপরও বিরূপ প্রভাব ফেলে।

সাংস্কৃতিক ফলাফল

সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও সুলতান মাহমুদের ভারত অভিযানের সুফল ও কুফল দুইই লক্ষ্য করা যায়। সুলতান মাহমুদ সম্পর্কে ঐতিহাসিক হেগ মন্তব্য করেন, "তিনিই প্রথম ভারতের মধ্যস্থলে ইসলামের পতাকা উড্ডীন করেন"। সুলতান মাহমুদের সৈন্যবাহিনীর সাথে অনেক সুফি-দরবেশ ও পন্ডিত ব্যক্তিও ভারতে আসেন। সুফি-দরবেশগণ ভারতে ইসলাম প্রচারে সহায়তা করেন। তাঁদের সান্নিধ্যে এসে বহু ভারতীয় ইসলাম গ্রহণ করে। পন্ডিত ব্যক্তিগণ ভারতের জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাথে ইসলামি চিন্তা-চেতনার পরিচয় ও সমন্বয় সাধন করেন। এতে দু'পক্ষই লাভবান হয়। উদাহরণ স্বরূপ বিখ্যাত পন্ডিত আল-বিরুনী দশ বছর ভারতে অবস্থান করেন। তিনি ভারতীয় পন্ডিতদের নিকট ভারতের দর্শন, সমাজ ব্যবস্থা ও কৃষি সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করেন। এর ফল স্বরূপ তিনি তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'কিতাব-উল-হিন্দ' প্রণয়ন করেন। গ্রন্থটি ভারত ইতিহাসের অমূল্য উপকরণ। মাহমুদের অভিযানের ফলে ইসলামি

সভ্যতা ও ভারতীয় সভ্যতার মধ্যে ভাব বিনিময় ঘটে। ভারত থেকে আহরণ করা সম্পদ সুলতান তাঁর নিজের ভোগ-বিলাসে ব্যয় করেন নি। তিনি তা কৃপণের মতো সঞ্চয় করেও রাখেন নি। এই সম্পদ তিনি শিক্ষা ও সংস্কৃতির উন্নয়নে ব্যয় করেন। রাজধানী গজনীতে তিনি বহু স্কুল , কলেজ ও হাসপাতাল স্থাপন করেন। তিনি রাজধানীকে মনের মতো করে সাজান। সেখানে অনেক সুরম্য স্থাপত্য ও রুচিশীল শিল্পের বিকাশ ঘটে। বহু কবি সাহিত্যিক তাঁর পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেন। সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে এই অভিযানের কুফলকেও উপেক্ষা করা যায় না। আল-বিরুনীর মতে, সুলতান মাহমুদের বার বার অভিযানের ফলে ভারতের প্রচুর ধন-সম্পদ ও হিন্দু সংস্কৃতি ধ্বংস হয়। এজন্য হিন্দুগণ মুসলিম বিজিত এলাকা থেকে দূরে সরে গিয়ে কাশ্মীর, বারাণসী ও অন্যান্য স্থানে আশ্রয় খুঁজে নিতে বাধ্য হয়।

সার-সংক্ষেপ

সুলতান মাহমুদের ভারত অভিযানের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ফলাফল ছিল সুদূর প্রসারী। বার বার আক্রমণের ফলে উত্তর ভারতের রাষ্ট্রগুলো দুর্বল হয়ে পড়ে। এর ফলে মুসলমানদের ভবিষ্যত ভারত বিজয়ের পথ সুগম হয়। এই অভিযান ভারতকে অর্থনৈতিক দিক দিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত করে। অপরদিকে গজনী সমৃদ্ধ হয়ে উঠে। সুফি-দরবেশদের প্রভাবে ভারতের বহু লোক ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। পরস্পরের সান্নিধ্যে এসে ইসলামি ও ভারতীয় উভয় সভ্যতাই লাভবান হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ৮.৬

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

১। সুলতান মাহমুদের ভারত অভিযানের প্রকোপ অনুভূত হয়–
- ক. সমগ্র উত্তর ভারতে।
- খ. সমগ্র ভারতে।
- গ. সমগ্র দক্ষিণ ভারতে।
- ঘ. সমগ্র উত্তর-পশ্চিম ভারতে।

২। সুলতান মাহমুদের মৃত্যু হয়–
- ক. ১০২৮ খ্রিস্টাব্দে।
- খ. ১০২৯ খ্রিস্টাব্দে।
- গ. ১০৩০ খ্রিস্টাব্দে।
- ঘ. ১০৩১ খ্রিস্টাব্দে।

৩। ভারতের মধ্যস্থলে ইসলামের পতাকা সর্বপ্রথম উড্ডীন করেন–
- ক. মুহম্মদ বিন-কাসিম।
- খ. সুলতান মাহমুদ।
- গ. সবুক্তগীন।
- ঘ. মুহম্মদ ঘোরী।

৪। কিতাব-উল-হিন্দ গ্রন্থের রচয়িতা–
- ক. আল-বিরুনী।
- খ. ওমর খৈয়াম।
- গ. ফেরদৌসী।
- ঘ. আনসারী।

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. সুলতান মাহমুদের ভারত অভিযানের রাজনৈতিক ফলাফলের বিবরণ দিন।
২. সুলতান মাহমুদের ভারত অভিযানের অর্থনৈতিক ফলাফল বর্ণনা করুন।
৩. সুলতান মাহমুদের ভারত অভিযানের সাংস্কৃতিক ফলাফল বিশ্লেষণ করুন।

পাঠ ৭

মুহম্মদ ঘোরীর ভারত অভিযান

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি–

- ঘোর রাজ্যের উৎপত্তি সম্পর্কে বর্ণনা দিতে পারবেন।
- মুহম্মদ ঘোরী কিভাবে মুলতান, সিন্ধু ও পাঞ্জাব দখল করলেন সে সম্পর্কে বিবরণ দিতে পারবেন।
- তরাইনের প্রথম ও দ্বিতীয় যুদ্ধ সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।
- মুহম্মদ ঘোরীর কনৌজ ও বারাণসী দখল সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।
- কুতুবউদ্দীন ও বখতিয়ার খলজী কর্তৃক বিজিত এলাকা সম্পর্কে বিবরণ দিতে পারবেন।
- মুহম্মদ ঘোরীর চরিত্র ও কৃতিত্ব সম্পর্কে বর্ণনা করতে করবেন।

মুহম্মদ ঘোরীর ভারত অভিযান

হিরাত ও গজনীর মধ্যবর্তী অঞ্চল ঘোর নামে পরিচিত। ১০১০ খ্রিস্টাব্দে সুলতান মাহমুদ ঘোর দখল করেছিলেন। তখন থেকে ঘোরের সরদারগণ গজনী রাজবংশের প্রতি অনুগত ছিলেন। পরবর্তীকালে গজনীর সুলতান বাহরাম শাহ কুতুবউদ্দীন নামক ঘোরের একজন সরদারকে হত্যা করেন। এতে তাঁর আত্মীয় ও অনুচরবর্গ গজনী রাজবংশের পরম শত্রুতে পরিণত হন। কুতুবউদ্দীনের পর তাঁর ভাই সাইফউদ্দীন এবং সাইফউদ্দীনের পর অপর ভাই আলাউদ্দীন ঘোরের নেতা হন। আলাউদ্দীন গজনী রাজবংশের উপর চরম প্রতিশোধ গ্রহণ করেন। তিনি গজনী দখল করেন এবং গজনী রাজবংশকে গজনী থেকে বিতাড়িত করেন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র সাইফউদ্দীন ঘোরের সুলতান হন। সেলজুকদের সাথে যুদ্ধে সাইফউদ্দীন নিহত হন। পরবর্তী সুলতান আলাউদ্দীন আপন ভাই শিহাবউদ্দীন মুহম্মদকে গজনীর শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। দুই ভাইয়ের মধ্যে অত্যন্ত হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্ক ছিল। শিহাবউদ্দীন মুহম্মদ ভারতের ইতিহাসে মুহম্মদ ঘোরী (বা ঘোরের মুহম্মদ) নামে পরিচিত। গজনীর শাসনকর্তা হিসেবেই মুহম্মদ ঘোরী ভারত অভিযান করেন। কুতুবউদ্দীন আইবেক, নাসিরউদ্দীন কুবাচা, তাজউদ্দীন ইয়ালদুজ প্রমুখ অনুচরবর্গ তাঁকে একাজে সহায়তা করেন।

ঘোর রাজ্যের উৎপত্তি

মুলতান, সিন্ধু ও পাঞ্জাব দখল

১১৭৫ খ্রিস্টাব্দে মুহম্মদ ঘোরী কারামতি শিয়াদের পরাজিত করে মুলতান দখল করেন। এরপর তিনি আর এক শিয়া সম্প্রদায় সুমরাদের কাছ থেকে সিন্ধু কেড়ে নেন। ১১৭৮ খ্রিস্টাব্দে তিনি গুজরাটের রাজধানী আনহিলওয়ার আক্রমণ করেন। কিন্তু গুজরাট রাজের হাতে তিনি পরাজিত হন। ১১৭৯ খ্রিস্টাব্দে তিনি পেশোয়ার অধিকার করেন। এরপর কয়েক বছর তিনি পাঞ্জাবের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত থাকেন। অবশেষে গজনী বংশের শেষ সুলতান খসরু মালিককে পরাজিত করে তিনি পাঞ্জাব ঘোর সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন।

তরাইনের প্রথম ও দ্বিতীয় যুদ্ধ

তরাইনের পথমযুদ্ধে ঘোরী পরাজিত হন এবং আহত হন

মুহম্মদ ঘোরী পাঞ্জাব দখল করলে ভারতের হিন্দু রাজগণ শঙ্কিত হয়ে উঠেন। দিল্লী ও আজমীরের রাজা পৃথ্বীরাজ চৌহান একটি শক্তি-সংঘ গঠন করেন। অনেক রাজা পৃথ্বীরাজের আহ্বানে সাড়া দেন। তবে কনৌজের রাজ্য জয়চাঁদের সাথে পৃথ্বীরাজের সুসম্পর্ক ছিল না। পৃথ্বীরাজ জয়চাঁদের কন্যা সংযুক্তার স্বয়ম্বর সভায় আমন্ত্রণ পাননি। তিনি ছদ্মবেশে এসে সংযুক্তাকে হরণ করে নিয়ে বিয়ে করেন। যাহোক, আসন্ন বিপদে জয়চাঁদ পৃথ্বীরাজকে সাহায্য করেননি। মুহম্মদ ঘোরী পৃথ্বীরাজের রাজ্য আক্রমণ করেন। ১১৯১ খ্রিস্টাব্দে তরাইন প্রান্তরে মিলিত হিন্দু বাহিনীর সাথে মুহম্মদ ঘোরীর প্রচন্ড যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে মুহম্মদ ঘোরীর পরাজয় হয়। তিনি নিজেও আহত হন। এটি তরাইনের প্রথম যুদ্ধ নামে পরিচিত।

তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধে ঘোরী বিজয় লাভ করেন

প্রথম চেষ্টায় ব্যর্থ হলেও মুহম্মদ ঘোরী দমবার পাত্র ছিলেন না। তিনি পর বৎসর অর্থাৎ ১১৯২ খ্রিস্টাব্দে আবার ভারত আক্রমণ করেন। এবারও হিন্দু বাহিনীর সাথে তরাইনের ময়দানেই তাঁর প্রচন্ড যুদ্ধ হয়। দু'পক্ষেই বহু সৈন্য নিহত হয়। শেষ পর্যন্ত হিন্দু বাহিনী পরাজিত হয়। পৃথ্বীরাজ পলায়ন

করেন। কিন্তু সরস্বতী নদীর তীরবর্তী সিরসুতী নামক স্থানে তিনি ধরা পড়েন। তাঁকে হত্যা করা হয়। আজমীর পর্যন্ত অঞ্চল মুসলমানদের দখলে আসে। বিশ্বস্ত অনুচর কুতুবউদ্দীন আইবককে বিজিত অঞ্চলের শাসনকর্তা নিযুক্ত করে মুহম্মদ ঘোরী গজনীতে প্রত্যাবর্তন করেন।

কুতুবউদ্দীন আইবক ও বখতিয়ার খলজীর বিজিত অঞ্চল

কুতুবউদ্দীন আইবক মুসলিম বিজয়কে আরও সম্প্রসারিত করেন। তিনি হানক্ষি, মীরাট, দিল্লী ও কুইলী দখল করেন। জয়চাঁদের সাথে মোকাবেলার জন্য মুহম্মদ ঘোরী ১১৯৪ খ্রিস্টাব্দে আবার ভারতে আসেন। কুতুবউদ্দীন তাঁর সাথে যোগ দেন। কনৌজ মুহম্মদ ঘোরীর দখলে এলো। তিনি আরও অগ্রসর হয়ে বারানসী অধিকার করলেন।

মুহম্মদ ঘোরী গজনী ফিরে যান। কিন্তু তাঁর প্রতিনিধি কুতবউদ্দীন গোয়ালিয়র জয় করেন। এরপর কুতুবউদ্দীন ভীমকে পরাজিত করে ১১৯৮ খ্রিস্টাব্দে গুজরাটের রাজধানী আনহিলওয়ার দখল করেন। ১২০২ খ্রিস্টাব্দে কালিঞ্জরও কুতুবউদ্দীনের অধিকারে আসে। কুতুবউদ্দীনের সেনাপতি বখতিয়ার খলজী ১২০২ খ্রিস্টাব্দে বিহার জয় করেন। ১২০৪ খ্রিস্টাব্দে বখতিয়ার খলজী সেন বংশের রাজা লক্ষ্মণ সেনকে পরাজিত করে বাংলার উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল পর্যন্ত মুসলিম সাম্রাজ্যের বিস্তার ঘটান।

১২০৩ খ্রিস্টাব্দে গিয়াসউদ্দীনের মৃত্যু হয়। তখন মুহম্মদ ঘোরী ঘোরের সিংহাসনে বসেন। সিংহাসনে আরোহণের সময় তিনি উপাধি গ্রহণ করেন মুইজউদ্দীন মুহম্মদ বিন সাম। ১২০৬ খ্রিস্টাব্দে জনৈক খোকার আততায়ীর হাতে তিনি নিহত হন।

মুহম্মদ ঘোরীর চরিত্র ও কৃতিত্ব

মুহম্মদ ঘোরী ছিলেন একজন মহান বিজেতা। তিনি ছিলেন বাস্তব রাজনীতিবিদ। তিনি সুচতুর ও অধ্যবসায়ী ছিলেন। কোন ব্যর্থতা কোনদিন তাঁকে দমাতে পারেনি। তাঁর মনোবল ও সংগঠনী শক্তি ছিল অসাধারণ। তিনি ধর্মভীরু ছিলেন। অন্য ধর্মের লোকের প্রতিও তিনি সদয় আচরণ করতেন। বড় ভাইয়ের প্রতি তিনি যে আনুগত্য দেখান ইতিহাসে তার দৃষ্টান্ত বিরল। তিনি দয়ালু ও ন্যায়বিচারের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। শিক্ষা, সাহিত্য ও শিল্পকলার প্রতি তাঁর অনুরাগ ছিল। তিনি ভারতে স্থায়ী মুসলমান শাসনের প্রতিষ্ঠা করেন। সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে তাঁর স্থান ইতিহাসে ম্লান।

মুহম্মদ ঘোরীছিলেন মহান বিজেতা ও বাস্তব রাজনীতিবিদ

সার-সংক্ষেপ

গিয়াসউদ্দীন মুহম্মদ ছিলেন ঘোরের সুলতান। তাঁর ছোট ভাই মুহম্মদ ঘোরী ছিলেন তাঁর অধীনে গজনীর শাসনকর্তা। মুহম্মদ ঘোরী ভারতে অনেকগুলো অভিযান পরিচালনা করেন। সুলতান, সিন্ধু ও পাঞ্জাব জয়ের পর ভারতের হিন্দু রাজশক্তিগুলোর সাথে তাঁর যুদ্ধ হয়। তরাইনের প্রথম যুদ্ধে তিনি পৃথ্বীরাজের নিকট পরাজিত হন। কিন্তু ১১৯২ খ্রিস্টাব্দে তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধে তিনি জয়লাভ করেন। পলায়নকালে পৃথ্বীরাজ নিহত হন। আজমীর তাঁর দখলে আসে। তিনি কুতুবউদ্দীনকে ভারতে তাঁর প্রতিনিধি নিযুক্ত করেন। কুতুবউদ্দীন দিল্লী সহ ভারতের অনেক অঞ্চল জয় করেন। ১১৯৪ খ্রিঃ কনৌজরাজ জয়চাঁদকে পরাজিত করে মুহম্মদ ঘোরী কনৌজ ও বারানসী দখল করেন। ১২০৩ খ্রিস্টাব্দে ভাইয়ের মৃত্যুর পর মুহম্মদ ঘোরী ঘোরের সুলতান হন। বখতিয়ার খলজী বিহার ও উত্তর-পশ্চিম বাংলা জয় করে মুসলিম সাম্রাজ্যের বিস্তার ঘটান। ১২০৬ খ্রিঃ মুহম্মদ ঘোরী নিহত হন। তিনি ভারতে মুসলিম শাসনের প্রতিষ্ঠাতা।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ৮.৭

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

১। দিল্লী ও আজমীরের রাজা ছিলেন–
ক. পৃথ্বীরাজ।
খ. জয়চাঁদ।
গ. ভীম।
ঘ. লক্ষণসেন।

২। জয়চাঁদ রাজা ছিলেন–
ক. দিল্লী ও আজমীরের
খ. গুজরাটের।
গ. কনৌজের।
ঘ. কালিঞ্জরের।

৩। তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধ সংঘটিত হয়–
ক. ১১৯১।
খ. ১১৯২।
গ. ১১৯৪।
ঘ. ১১৯৮।

৪। যে মুসলিম সেনাপতি সর্বপ্রথম বিহার জয় করেন–
ক. মুহম্মদ ঘোরী।
খ. কুতুবউদ্দীন আইবক।
গ. নাসিরউদ্দীন কুবাচা।
ঘ. বখতিয়ার খলজী।

সংক্ষিপ্ত–উত্তর প্রশ্ন

১. কিভাবে ঘোর রাজ্য শক্তিশালী হয়ে উঠে বর্ণনা করুন।
২. তরাইনের প্রথম ও দ্বিতীয় যুদ্ধ আলোচনা করুন।
৩. মুহম্মদ ঘোরীর চরিত্র ও কৃতিত্ব মূল্যায়ন করুন।

পাঠ ৮

পাঠ– ৮ ঃ মুহম্মদ ঘোরীর ভারত অভিযানের ফলাফল

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি–

- মুহম্মদ ঘোরীর ভারত অভিযানের রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ফলাফল সম্পর্কে বিবরণ দিতে পারবেন।
- এই অভিযানের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক ফলাফল বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

মুহম্মদ ঘোরী ভারতে অনেকগুলো অভিযান করেন। এই অভিযানগুলোর ফলাফল ছিল সুদূরপ্রসারী। এই ফলাফলকে আমরা রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক এবং ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক এই দুইভাগে ভাগ করে আলোচনা করতে পারি।

রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ফলাফল

মুহম্মদ ঘোরীর ভারত অভিযানের ফলাফল

মুহম্মদ ঘোরীর ভারত অভিযানের ফলাফল রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী মুসলিম অভিযানগুলো অপেক্ষা অধিকতর সফল ও ব্যাপক ছিল। মুহম্মদ বিন-কাসিমের বিজয় শুধুমাত্র সিন্ধু ও মুলতানে সীমাবদ্ধ ছিল। সুলতান মাহমুদ ১৭বার ভারত অভিযান করলেও এর তেমন কোন রাজনৈতিক ফলাফল ছিল না। তাঁর অভিযানগুলো ভারতীয় রাজন্যবর্গের সামরিক শক্তি দুর্বল করে দিয়েছিল। পক্ষান্তরে মুহম্মদ ঘোরীর ভারত অভিযান এদেশে মুসলমান শাসন স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত করে। তিনি মুলতান, সিন্ধু ও পাঞ্জাব দখল করার পর ভারতের গভীর অভ্যন্তরে প্রবেশ করেন। তরাইনের যুদ্ধে জয়লাভের ফলে তিনি আজমীর পর্যন্ত এলাকা জয় করেন। তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধের গুরুত্ব সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে ভি.এ. স্মিথ বলেন, "এই যুদ্ধ হিন্দুস্থানের উপর মুসলিম আক্রমণের চরম সাফল্যের নিশ্চয়তা দান করেছিল।" বিজিত এলাকা শাসন করার জন্য তিনি তাঁর সেনাপতি কুতুবউদ্দীন আইবেককে প্রতিনিধি হিসেবে রেখে যান। কুতুবউদ্দীন হানসি, মীরাট, দিল্লী, কুইল, গোয়ালিয়র, গুজরাট ইত্যাদি জয় করে উত্তর ভারতের বিস্তীর্ণ অঞ্চল মুসলিম শাসনাধীনে আনেন। বস্তুত: কুতুবউদ্দীনের বিজয় ছিল তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধে মুহম্মদ ঘোরীর বিজয়েরই যৌক্তিক পরিণতি। কনৌজরাজ জয়চাঁদকে তিনি চান্দওয়ারের যুদ্ধে ভীষণভাবে পরাজিত করে কনৌজ ও বারানসী জয় করেন। কনৌজ ও বারাণনসী জয় করে মুহম্মদ ঘোরী ভারতে মুসলিম বিজয়কে সুসংহত করেন। এ বিজয়ের ফলাফল সম্পর্কে প্রফেসর এস. আর. শর্মা মন্তব্য করেন, "চান্দওয়ারের যুদ্ধে জয়চাঁদ পরাজিত হওয়ায় মুহম্মদ ঘোরী ভারতের রাজনৈতিক কেন্দ্র কনৌজ ও ধর্মীয় কেন্দ্র বারানসী হস্তগত করতে সমর্থ হন।"

মুহম্মদ ঘোরীর ভারত অভিযান এদেশে মুসলমান শাসন স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত করে

এরপর বখতিয়ার খলজীর বিহার ও বাংলা জয়ের মধ্য দিয়ে প্রায় সমগ্র উত্তর ভারতে মুসলিম আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। যুদ্ধ তারপরও হয়েছে এবং অবিশ্রান্তভাবেই হয়েছে। তবে সে সকল যুদ্ধ ছিল মুসলিম সাম্রাজ্য সম্প্রসারণের জন্য, স্থাপনের জন্য নয়। প্রতিষ্ঠিত সাম্রাজ্য শাসনের জন্য প্রয়োজন পড়লো নতুন প্রশাসনের। মুহম্মদ ঘোরীর প্রতিনিধি হিসেবে কুতুবউদ্দীন ভারতীয় প্রশাসনিক রীতির সাথে ইসলামি রীতির মিলন ঘটান। ফলে উদ্ভব ঘটে এক নতুন প্রশাসনিক ব্যবস্থার। কুতুবউদ্দীন প্রশাসনে স্থানীয় ব্যবস্থাপকদের হাতেই ন্যস্ত থাকে। বিচার কাজ সম্পন্ন ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য মুসলমান কাজী ও ফৌজদার নিযুক্ত হন।

ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক ফলাফল

মুহম্মদ ঘোরীর অভিযানের ফলে ভারতের ধর্মীয় এবং সাংস্কৃতিক জীবনেও ব্যাপক রদবদল হয়। নতুন অঞ্চল বিজিত হওয়ায় মুসলমান শিক্ষাবিদ, ধর্মপ্রচারক ও শিল্পীগণ নতুন ও বিস্তৃত কর্মক্ষেত্রের সন্ধান পান। অনেক ধর্মীয় নেতা ও সুফি দরবেশ এদেশে আসেন। তাঁরা ধর্মপ্রচারে ব্রতী হন। দলে দলে মানুষ ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় নিতে থাকে। বিজিত অঞ্চলে মক্তব, মাদ্রাসা ও খানকাহ্ গড়ে উঠতে থাকে। ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থা এদেশে নতুন সভ্যতার সূচনা করে। ভারতীয় স্থাপত্যরীতিতেও সাধিত হয় ব্যাপক পরিবর্তন। মুসলিম বিজেতাগণ প্রয়োজনের তাগিদে এবং ইসলামের গৌরব প্রকাশের জন্য সুদৃশ্য ইমারত, মসজিদ ও মিনার নির্মাণে হাত দেন। এ সকল

মুহম্মদ ঘোরীর ভারত অভিযান এদেশে এক নতুন প্রভাবের সূচনা করে। দলে দলে মানুষ ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় নিতে থাকে।

স্থাপত্য নির্মাণে স্থানীয় উপকরণ ব্যবহৃত ও শ্রমিক নিয়োজিত হয় এবং ফলে ভারতীয় ও ইসলামী স্থাপত্য কৌশলের সংযোজন ঘটে। এক নতুন ইন্দো-ইসলামীক স্থাপত্যরীতির উদ্ভব হয়। এভাবে মুহম্মদ ঘোরীর ভারত অভিযান এদেশে এক নতুন প্রভাতের সূচনা করে।

সার-সংক্ষেপ

মুহম্মদ ঘোরীর ভারত অভিযানের ফলাফল ছিল সুদূর প্রসারী। এই অভিযানের ফলে এদেশে মুসলমান শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রায় সমগ্র উত্তরভারত মুসলিম প্রাধান্যের আওতায় আসে। এদেশে নতুন প্রশাসন ব্যবস্থা গড়ে ওঠে। ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও বড় ধরণের পরিবর্তন সূচিত হয়। ইসলাম ধর্মের প্রসার ঘটে। ইন্দো-ইসলামী স্থাপত্য রীতির উদ্ভব হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ৮.৮

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

১। ভারতে মুসলিম শাসনের প্রতিষ্ঠাতা–
- ক. মুহম্মদ বিন-কাসিম।
- খ. সুলতান মাহমুদ।
- গ. মুহম্মদ ঘোরী।
- ঘ. কুতুবউদ্দীন আইবেক।

২। জয়চাঁদের সাথে মুহম্মদ ঘোরীর যুদ্ধ হয়–
- ক. তরাইনে।
- খ. আনহিলওয়ারে।
- গ. আজমীরে।
- ঘ. চানুওয়ারে।

৩। ভারতে ইসলাম প্রচার করেন–
- ক. ধর্মীয় নেতা ও সুফি-দরবেশগণ।
- খ. বিজেতাগণ।
- গ. মুসলিম শিক্ষাবিদগণ।
- ঘ. মুসলিম শিল্পীগণ।

৪। ভারতে মসজিদ ও মিনার নির্মাণে যে দেশের শ্রমিক নিয়োজিত হয়–
- ক. ঘোরের শ্রমিক।
- খ. স্থানীয় শ্রমিক।
- গ. গজনীর শ্রমিক।
- ঘ. ইরানের শ্রমিক।

সংক্ষিপ্ত–উত্তর প্রশ্ন

১. মুহম্মদ ঘোরীর ভারত অভিযানের রাজনৈতিক ফলাফল আলোচনা করুন।
২. মুহম্মদ ঘোরীর ভারত অভিযানের প্রশাসনিক ফলাফল সম্পর্কে বর্ণনা দিন।
৩. মুহম্মদ ঘোরীর ভারত অভিযানের ধর্মীয় ফলাফল বর্ণনা করুন।
৪. মুহম্মদ ঘোরীর ভারত অভিযানের সাংস্কৃতিক ফলাফল বিশ্লেষণ করুন।

চূড়ান্ত মূল্যায়ন- ৮ : রচনামূলক প্রশ্ন

১. মুহাম্মদ বিন কাসিমের সিন্ধু বিজয়ের কারণ ও ফলাফল সম্পর্কে আলোচনা করুন।
২. সুলতান মাহমুদের ভারত অভিযানের কারণ ও ফলাফল সম্পর্কে আলোচনা করুন।
৩. মুহম্মদ ঘোরীর ভারত অভিযান এবং তার ফলাফল সম্পর্কে আলোচনা করুন।

উত্তরমালা

পাঠ ৮.১	ঃ	১. খ	২. ক	৩. গ	৪. ঘ
পাঠ ৮২	ঃ	১. ক	২. খ	৩. গ	৪. ঘ
পাঠ ৮.৩	ঃ	১. ক	২. খ	৩. ঘ	৪. গ
পাঠ ৮.৪	ঃ	১. খ	২. গ	৩. ঘ	৪. ক
পাঠ ৮.৫	ঃ	১. ক	২. খ	৩. গ	৪. গ
পাঠ ৮.৬	ঃ	১. ঘ	২. গ	৩. খ	৪. ক
পাঠ ৮.৭	ঃ	১. ক	২. গ	৩. খ	৪. ঘ
পাঠ ৮.৮	ঃ	১. গ	২. ঘ	৩. ক	৪. খ